ঘুরে দাঁড়ানো (দি টার্নিং)

মার্টিন হাইডেগার

ফ্রেমে বাঁধাই করা অর্থাৎ ঘেরের মধ্যে আনার সার হচ্ছে নিজের উপস্থিতির সত্যটিকে বিস্মৃতিতে ঠেলে দেবার জন্য নিজের ফাঁদেই তাকে ফেলা। এই ফাঁদে ফেলা ক্রিয়াটি ছদ্মবেশে আসে কেননা যা কিছু উপস্থিত হয় তাকেই এ এক স্থায়ী আমানত করে তোলে আর সেই আমানত রূপেই আধিপত্য করতে থাকে।

এই ঘেরের মধ্যে বাঁধাই এক বিপদ হয়ে আসে। কিন্তু বিপদ কি নিজেকে বিপদ বলে ঘোষণা করে? না। মানুষ সর্বদা সর্বত্র বিপদের চাপে থাকে। কিন্তু বিপদটা হল এই যে সত্তা এই আপন উপস্থাপনার ঘোমটার আড়ালে ছদ্মবেশে থাকে। বিপদের মধ্যে সবথেকে বড় বিপদ হল এই নিজেকে ছদ্মবেশ দেওয়া। পাড় বাঁধাই বা ঘের দেওয়ার মধ্যে যে বিন্যাস বা গোছানো নিহিত থাকে তারই সঙ্গে তাল রেখে যেন প্রযুক্তি মানুষের হাতে একটা উপায় হয়ে উঠেছে। আসলে মানুষের উপস্থিতিকেই সম্পন্ন করানোর জন্য প্রযুক্তিকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

এর অর্থ কি এই যে ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক মানুষকে অসহায় ভাবে প্রযুক্তির হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে? না—ঠিক উল্টোটা। কিন্তু প্রকৃতই এটা বিরুদ্ধের বাড়তি একটা ভিন্ন বস্তু।

যদি ঘের দেওয়া (সীমা বন্ধন, পাড় বাঁধানো) সত্তার উপস্থিতির এক বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে সাহস করে বলতে পারি যে যে সত্তার উপস্থিতি হওয়ার একটি বিশেষ প্রকার রূপে এই সীমাবন্ধন অর্থাৎ ঘের দেওয়া পরিবর্তিত হয়। কেন না লক্ষ্য নির্দেশের বিশেষ চরিত্রই হল যে সর্বদাই একরূপ যে বিন্যাস তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। মানিয়ে নিয়ে ঘটার অর্থ চোখের সামনের পথনির্দেশের সঙ্গে তাল রেখে গুছিয়ে নেওয়ার শুরু। এর জন্য অপেক্ষা করে আছে ঘোমটায় ঢাকা আর একটি লক্ষ্য। লক্ষ্য নির্ধারণ করা যার চরিত্র সে নিজেই কোনও একটি বিশেষ ক্ষণে অন্য একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই দ্বিতীয় লক্ষ্যের মধ্যে সে ডুবেও যায় না—হারিয়েও যায় না। ঐতিহাসিক সবকিছুর সারটিকে লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করা। বিন্যাস করা আর সেভাবে মানিয়ে নেওয়া—এইভাবে জানার পক্ষে আমরা অনভিজ্ঞ এবং বিবেচনাহীন। অভ্যাসবশতই সহজেই ভাবি যে লক্ষ্য নির্দেশ করা মানেই ঘটনা ঘটা—আর সেটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক অর্থে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা ইতিহাসকে মূলত লক্ষ্য নির্দেশ

ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত—না ভেবে তাকে ঘটনার রাজ্যে স্থাপন করি। কিন্তু লক্ষ্যনির্দেশ আসলে সত্তারই লক্ষ্যনির্দেশ। সত্তা নিজেকে মানিয়ে নেয়। লক্ষ্যনির্দেশরূপেই উপস্থিত হয় এবং তদনুসারে লক্ষ্যনির্দেশরূপেই পরিবর্তিত হয়। যদি সত্তার কোনও পরিবর্তন (অর্থাৎ সীমাবন্ধন বা ঘের দেওয়া রূপে উপস্থিত হয়ে) ঘটে তবে তার অর্থ কোনও মতেই এই দাঁড়াবে না যে প্রযুক্তি (যার সারমত্তা ঘের দেওয়াতেই নিহিত) একেবারে পরিত্যক্ত হবে। প্রযুক্তিকে আহত ভূপাতিত করা যাবে না। প্রযুক্তি বিনষ্টও হবে না।

যদি প্রযুক্তির উপস্থিতির সারভূত সীমাবন্ধন বা ঘের দেওয়া সত্তার অন্তর্নিহিত বিপদ হয় অর্থাৎ সত্তাস্বরূপই হয় তাহলে প্রযুক্তির কখনও সদর্থক বা নঙর্থক কোনও অর্থই নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষের কোনও কর্মের দ্বারা পরাভূত হবে না। সত্তার সারবস্তু প্রযুক্তি মানুষের দ্বারা জিত হবে না। যদি হত, তাহলে এই দাঁড়াত যে মানুষই সত্তার প্রভু।

তৎসত্ত্বেও সত্তা যেহেতু প্রযুক্তির সার হিসাবে নিজেকে সীমাবন্ধনক্রিয়া রূপে মানিয়ে নিয়েছে আর যেহেতু মানুষের উপস্থিতি সত্তার উপস্থিতির সঙ্গে জড়িত (সত্তার উপস্থিতির জন্য মানুষের উপস্থিতির তো প্রয়োজন, যাতে যা কিছু আছে তার মধ্যেই সুরক্ষিত হয়ে টিঁকে থাকতে পারে) তাই প্রযুক্তিকে মানুষের সাহায্য ছাড়াই লক্ষ্য পরিবর্তনে বাধ্য করা যাবে না। এই সাহায্য নিয়ে প্রযুক্তি অবশ্য মানুষের দ্বারা পরাজিত হবে না। উলটে প্রযুক্তির উপস্থিতি এমনভাবেই অতিক্রান্ত হবে যে তার আপন আবরিত সত্যটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই ফিরিয়ে দেওয়ারূপ অতিক্রম ক্রিয়াটি মানুষের জগতে শোকদুঃখ জয় করার সদৃশ। কিন্তু এইক্ষণে এইস্থানে সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করা মানে প্রত্যেকবার একটি নূতন লক্ষ্যের আগমন। কিন্তু এই নবাগমন যুক্তি তর্ক দিয়ে বা ঐতিহাসিকভাবে আগে থেকে জানা যায় না অথবা ঐতিহাসিক কোনও ধারা থেকেই অধিবিদ্যারূপে নির্মিত হতে পারে না। কেন না ঐতিহাসিকরূপে কথিত কোনও ঘটনাই লক্ষ্য নির্দেশকে নির্দিষ্ট করে না বরং প্রত্যেকটি পুনরুপস্থিত উদাহরণই কায়েমীরূপে কথিত হয় বলে সত্তার লক্ষ্যনির্ধারণরূপে লক্ষ্যনির্ধারণেরই চরিত্র পায়।

প্রযুক্তির সারের এই পুনরধিষ্ঠানের জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় এবং তাকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মানুষকে এক্ষেত্রে সেই সারবস্তুরূপেই ব্যবহার করা হয় যেটা ঐ অতিক্রমণেরই অনুরূপ। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষকে প্রথমে প্রযুক্তির সারের কাছে নিজেকে খুলে ধরতে হবে। এই উন্মোচনরূপ ঘটনা ঘটনা হিসাবে প্রযুক্তিকে বা তার উপায়কে সমর্থন করার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ যাতে তার নিজস্বরূপে প্রযুক্তির সারবস্তুর দিকে মনোযোগ দিতে পারে আর যাতে মানুষের সঙ্গে প্রযুক্তির সারের দিক থেকে সম্পর্কস্থাপন করা যায় তাকে সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি তার আপন সারের উপযুক্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটিতে ফেরার পথটি খুঁজে পেতে হবে। সত্তার যাকে প্রয়োজন সত্তা যাকে ব্যবহার করে সেই মানুষের সারবস্তুর (মানুষ মানে সে যার হাতে সত্তার সুরক্ষার ভার) সঙ্গে—সেই সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত যা তাকে অতিক্রম করে নিজের অতিরিক্ত কিছুর সঙ্গে সংযোগ। এর থেকেই মানুষের সারসত্তা তার পরিধি পায়। নিজের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণেই

নিজেকে পূর্বাহ্ণেই স্থাপিত করে সেখানে বাস করতে আরম্ভ না করলে এখন যে লক্ষ্যনির্ধারণ ক্রিয়া চলছে মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এই বিবেচনার সময় শ্রীএক্‌হার্টের একটি বচনের মৌলিক আকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবহিত হতে পারি। বচনটি হল—যাদের সারসত্তা বিশাল নয় তাদের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়। মানুষের মহান সারবস্তুর বিষয়েই আমরা ভাবনাচিন্তা করছি কেন না মানুষের সারবস্তু সত্তার সারবস্তুতেই নিহিত আর আপন সত্যের মধ্যে নিজ উপস্থিতির আগমনটিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সত্তার-একে প্রয়োজন।

সুতরাং সবার উপরে যা আবশ্যিক তা হ'ল বিবেচনীয় হিসাবে সত্তার সারবস্তুকে গ্রহণ করার আগেই অর্থাৎ এইভাবে বিবেচনা করার অভিজ্ঞতা হবার আগেই, ভারটা কতদূর অবধি আমাদের উপর পড়েছে আর অদ্যাবধি যা অগম্য থেকে গেছে সেই পথটি প্রস্তুত করার ভারও যে কাঁধে এসেছে সেইটি জানা।

এ সবই আমরা করতে পারি যদি এখনই যেটা জরুরি সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করার আগে 'আমরা কেমন করে চিন্তা করবো' এই ভাবনাটা করি। কেন? ভাবনাচিন্তা করা হল নির্ভেজাল আসল ক্রিয়া, নিখাদ হাত লাগানো—হাত লাগানো মানে অবশ্য সত্তার সার সে উপস্থিতি তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো। এর অর্থ হল সব বিদ্যমানের (অস্তির) মধ্যে সত্তার আপন প্রকাশের আলয়টিকে প্রস্তুত করা। সবরকম উদ্দেশ্যমূলক ভাবনাকেই ভাষা রাস্তা এবং অলিগলি চিনিয়ে দেয়। ভাষা ছাড়া কোনও ক্রিয়াই সর্বত্র করা বা কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যই ভাষা কখনওই প্রাথমিক ভাবে ভাবনা, অনুভব আর ইচ্ছা করার অভিব্যক্তি নয়। ভাষাই হচ্ছে সেই মৌলিক মাত্রা যার ভিতরে মানুষের সারবস্তুটি আদৌ সত্তার সাদৃশ হতে পারে আর সেভাবেই তার অঙ্গীভূত হতে পারে। এই প্রাথমিক সাদৃশ্য প্রকাশ্যে সাধিত হওয়াই হল ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই আমরা সেই রাজ্যে বাস করতে শিখি যেখানে লক্ষ্যটি অতিক্রমকরারূপ পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াটি চালু।

বিপদটি হল ওই ঘেরের মধ্যে আনা ক্রিয়াটির উপস্থিত হওয়া। সত্তা আবার নিজের বিস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের উপস্থিত হওয়ার দিকে পিঠ ফেরায় আর সেই সঙ্গে আপন উপস্থিতির সত্যতার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। এই পিঠ ঘোরানো যা এখনও পর্যন্ত অচিন্তিতই আছে সেটাই বিপদ, আর সেটাই শাসন চালাচ্ছে। বিপদটা উপস্থিত হলে সম্ভবত নিজেকে লুকিয়ে রাখবে। সত্তার অঙ্গ হিসাবে যে বিস্মৃতির কথা বলা হল সেটা এমনভাবেই পিঠ ফেরাবে যে সত্তার উপস্থিত হওয়া ক্রিয়াটি খোলাখুলিভাবেই নিজের দিকে অর্থাৎ নিজের বাড়ির দিকে ফেরা হয়ে দাঁড়াবে।

তবুও হয়তো এই মোড়ঘোরা সত্তার বিস্মৃতিকে সত্তার উপস্থিতির সুরক্ষায় রেখে দেওয়া এমন সময়েই ঘটবে যখন বিপদটা চাপা দেওয়া অবস্থায় সর্বদাই মোড় ঘুরতে পারে— বিপদরূপে আলোয় প্রকাশিত হয়। হয়তো মোড় ঘোরার আগে আগেই যে ছায়া পড়ে আমরা সেই ছায়াতেই আছি। কেউ জানে না কবে কিভাবে এটা লক্ষ্য নির্ধারণ রূপে আরম্ভ হবে। জানা আবশ্যিকও নয়। এরকম একটা জ্ঞান মানুষের পক্ষে বিধ্বংসী (প্রলয়ঙ্কর)

হতে পারে। কেন না মানুষের সারসত্তা হল অপেক্ষমান হওয়া—সত্তার উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। এই চিন্তার মাধ্যমেই সে সত্তাকে আগলে রাখে। মানুষ শুধু সত্তার সত্যতার তুচ্ছ জিজ্ঞাসু এক রাখাল না হয়ে সত্তার উপস্থিতির যাচক হতে পারে।

কিন্তু যেখানে বিপদটা বিপদরূপেই ঘটে তখন প্রথম সে একেবারে আঢাকা বিপদ। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হোল্ডারলিনের কয়েকটি ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তির অনুধাবন করতে পারি। পাটমস্ নামের স্তোত্রের পরর্বতী সংস্করণের শুরুতেই কবি বলছেন—যেখানেই বিপদ সেখানেই সুরক্ষার ত্রাণের শক্তিও জন্মায়। কবি যেভাবে গেয়েছিলেন তার থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, যতদূর সম্ভব গভীরে ভাবি তাহলে বুঝবো যে যেখানে বিপদ তার স্বরূপে রয়েছে সেখানেই ত্রাণের শক্তি সজীব হয়ে বেড়ে উঠেছে। শেষোক্তটি হঠাৎ ঘটে না। ত্রাণের শক্তি বিপদের অনুগামী দ্বিতীয় মাত্র নয়। বিপদ নিজেই স্বরূপত তারক ত্রাণশক্তি। বিপদ নিজেই তারক কেন না সে ত্রাণশক্তিকে তার লুকানো সারসত্তার থেকে বাইরে বার করে আনে। এই সার-সত্তা সদাই পথের মোড় ফেরার দিকে ঝুঁকে আছে। ত্রাণ করার অর্থ কী? এর অর্থ বাঁধন ঢিলে করা, মুক্ত ক'রা, স্বাধীন ক'রা, আঘাত হতে রক্ষা করা, লালন করা, বাঁচিয়ে রেখে আশ্রয় দেওয়া, নিজের শরণাশ্রিত করা আর নিরাপদ সুরক্ষিত রাখা। লেসিং সত্যতা সমর্থন বা নিষ্পাদন এই অর্থে 'ত্রাণ করা' শব্দটি জোর দিয়েই ব্যবহার করেছেন। এই সত্যতা প্রতিপন্ন করা হল সারসত্তার মধ্যে বা ন্যায্য এবং যথার্থ তাই ফিরিয়ে আনা আর সেখানেই সুরক্ষিত রাখা। যা সত্যই ত্রাণ করে তরা কাজ হল নিরাপদে রাখার জন্য সুরক্ষিত করা।

কিন্তু বিপদটা কোথায়? তার স্থান কোথায়? বিপদ যেহেতু সত্তা স্বয়ং তাই সে একইকালে সর্বত্রই আছে আবার কোথাও নেই। স্বয়ং রূপে ছাড়া আর কোনও রূপেই তার স্থান নেই। সকল উপস্থিতির দেশহীন নিবাস সে স্বয়ং। নব যুগপ্রবর্তক ঘটনা হল সীমাবন্ধন ক্রিয়া হয়ে সত্তার উপস্থিত হওয়া।

বিপদ যখন বিপদই তখনই স্পষ্টরূপে এর উপস্থিত হবার ঘটনা ঘটে। সত্তার অঙ্গীভূত যে সুরক্ষার ক্ষমতাটি বিস্মৃতির সাহায্য নিয়ে সত্তাকে দিয়ে তার নিজের উপস্থিতিকরণকে অস্বীকার করায় সেটাই এই ফাঁদে ফেলার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। এই বিস্মৃতির সাহায্যে ফাঁদে ফেলা যখন স্পষ্টভাবে ঘটে তখন বিস্মৃতি ভিতরে ঢুকে স্থিতু হয়ে থাকতেই থাকে। স্মৃতির এলাকাচ্যুত হওয়া থেকে বেঁচে গিয়ে এটা আর বিস্মৃতি নয়। এইরকম ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সত্তার সুরক্ষা আর সত্তার বিস্মৃতি নয় বরং 'ফিরে আসা'—আর সেইভাবেই সে সত্তার সুরক্ষক হয়ে ওঠে আর স্থিতু হয়। যখন বিপদ বিপদরূপে বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সুরক্ষাও হয় তখন জগৎসংসারই ঘটে যায়। জগৎ হিসাবে জগৎ যে ঘটে। বস্তু বস্তু হয়ে ওঠে সেটাই সত্তার একটা সুদূরবর্তী আবির্ভাব।

সত্তার এই আত্মনিষেধ, বা বিস্মৃতির ফাঁদে নিজেকে আটক করে সে এখনও অবধি না দেওয়া একটি বরকে হাতে রেখে দিয়েছে। বরটি হল যে এই ফাঁদে ফেলা আবার ফিরে দাঁড়াবে, ফলে বিস্মৃতিও ফিরে দাঁড়িয়ে সত্তার উপস্থিতিকে ছদ্মবেশ ধারণকালে সুরক্ষা

দেবে। বিপদের মধ্যে বিপদের এই বিপদরূপে উপস্থিতি সুরক্ষার নিজেরই মুখ ফেরানো। আসলে নিরাপত্তা বিধানই সত্তার তারকশক্তি।

বিপদের এই ফিরে দাঁড়ানো কেবলমাত্র মাধ্যম ছাড়াই ঘটতে পারে। কারণ সত্তার সমকক্ষ কেউ নেই। কেউই তাকে ঘটাতে পারে না—সে নিজেও কিছু ঘটায় না। কার্যকারণ সমন্বয়ের আওতায় সত্তা তার পথ চলে না। যা কিছুই কার্যকারী সত্তারূপে সে তার নিজেকে মানিয়ে নেবার কোনও প্রকারের পূর্ববর্তী। আর কার্য হয়ে কোনও কিছুই সত্তা হিসেবে তার পরবর্তী হতে পারে না। 'লুকিয়ে থাকা' রূপ আপন সারের মধ্য থেকেই সত্তা তার যুগারম্ভে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং অবহিত হতে হবে। বিপদের ঘুরে দাঁড়ানো সহসে ঘটে। এই ঘুরে দাঁড়ানোয় সত্তার সারীভূত স্বচ্ছীকরণই হঠাৎ নিজেকে পরিষ্কার করে। আলোকিত করে। এই সহসা আত্মআলোকিতকরণ হল বিদ্যুৎচমক। নিজের যে ঔজ্জ্বল্য নিজেই সৃজন করেছে নিজেকে তারই মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আর ঢুকিয়ে দেয়।

বিপদের এই ফিরে দাঁড়ানোয় যখন সত্তার সত্যতাটিও বালক দেয় এখন সারবস্তুর উপস্থিতিও ফিরে দাঁড়ায় আর প্রবেশ করে। এই ফিরে দাঁড়ানো কোন্ অভিমুখে ঘটে? সত্তার নিজের দিকে ছাড়া অন্য কোনও অভিমুখেই নয়—যে সত্তা আপন বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু এই সত্তাই তো সেই সত্তা যা সীমাবন্ধন (ঘের দেওয়া) রূপ প্রযুক্তির উপস্থিতি হওয়া। প্রযুক্তির উপস্থিতিরূপে বিস্মৃতির এই ফেরা এক যুগারম্ভ। যা প্রকৃতই বিদ্যমান তা কখনও ব্যক্তিবিশেষ সত্তা নয়। যা প্রকৃতই বিদ্যমান অর্থাৎ যা স্পষ্টভাবে 'অস্তি' তার মধ্যে বর্তমান আর স্থিতু হয়ে যেটা থাকে সেটাই অনন্যরূপে সত্তা। 'অস্তি'/সত্তা সত্তারূপেই—অস্তিত্ব বা বিদ্যমান যা ঘটায় তা ঘটাতে পারে। 'অস্তি' হচ্ছে আপন সারসত্তা হ'তে নির্গত সত্তা।

আপন উৎস ও অভিধার দিক হতে এই ঝলকটা হল ঝাঁকি দর্শন। চোখের পলকে দেখা। এই পলকের দর্শনে সারসত্তা তার আলোক বিচ্ছুরণের মধ্যে প্রবেশ করে। আপন উপাদানের মধ্যে চলতে চলতে এই দৃষ্টি যার দর্শন পেয়েছিল তাকে আবার ফিরে পায় এবং আপন দৃষ্টির আলোর ঔজ্জ্বল্যে ফিরিয়ে আনে। আর এ সত্ত্বেও একই সঙ্গে এই চাহনি আলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনালোকিত উৎসটির লুকানো অন্ধকারটিকে নিরাপদে রাখে। সত্তার সততার যেটা এই একঝলকের দেখার নিজের দিকে বা ভিতর দিকে ফেরার বিদ্যুচ্চমক সেটাই হচ্ছে ঝলকের দেখা—অন্তর্দৃষ্টি। আমরা সত্তার সত্যকে ধারণায় ধরেছি, চিন্তা করেছি যেন দর্পণে প্রতিফলিত আকাশ পৃথিবী মরবৃন্দ ও দেবতাকুল এই চারটির লীলারূপে। বিস্মৃতি যখন ফিরে দাঁড়ায় সত্তার সুরক্ষারূপে জগৎ এসে যায় তখনই জিনিসটির হানিকারক অনাদর উপেক্ষাটিও পলকে দেখতে পাই। সীমাবন্ধনের নিয়ম হিসাবেই এই অনাদর/উপেক্ষা ঘটে। জগৎবিষয়ক পলকের অন্তর্দৃষ্টি সত্তার সত্যতাকে সত্যবিরহিত রূপে গণ্ডীবদ্ধ করে মুহূর্তের দেখা মাত্র। সত্তার অন্তর্নিহিত 'হওয়া'কে উদ্ঘাটিত করাই হচ্ছে অন্তর্ঝলক। ঘটনার উদ্ঘাটন আবরণ উন্মোচন হচ্ছে নিজেকেই নিজের সামনে আনা।

'যা কিছু বিদ্যমান সে বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি' এই নামটি এখন যা ঘটনার সত্তার ভিতরে মোড় ফেরার উদ্ঘাটনকে আপনার মধ্যে ফিরিয়ে আনে। যা সত্তার উপস্থিতি হওয়াকে নস্যাৎ করে দেওয়াকে সত্তার সুরক্ষাসাধনে পরিবর্তিত করে—তারই উদ্ঘাটনের অভিধা। এটা হচ্ছে সত্তার অন্তঃসারের অন্তর্গত জ্যোতিঃপুঞ্জ। এই জ্যোতিঃপুঞ্জই হল সেই মাত্রা যাকে সত্তা বিপদরূপে উপস্থিত হয়। সেই মাত্রা যাতে সত্তা বিপদরূপে উপস্থিত হয়।

প্রথম থেকেই আর প্রায় শেষ অবধি যা বিদ্যমান/অস্তি তার বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি তাকেই বোঝায় সেই এক ঝলক দেখা যা আমরা মানুষরা নিজেদের ভিতর থেকে বিদ্যমানগুলির মধ্যে নিয়ে যাই বা ফেলি। যেটা আছে বলতে যা সত্তায় আছে তাকেই বুঝি কেন না আছে বা অস্তি তার বিষয়েই প্রযোজ্য যার সত্তা আছে। এখন তো সবকিছুই উল্টোমুখো হয়ে গেল। অন্তর্দৃষ্টি কোনও পরীক্ষা নয় যা আমরা নিজেরাই করি। অন্তর্দৃষ্টি যেমন ঝলকানি—সত্তার আপন উপস্থিতির অন্তর্নিহিত জ্যোতিঃপুঞ্জের উদ্ঘাটন—আর সেটাও সীমাবন্ধন যুগারম্ভক ঘটনার মধ্যে।

সীমাবন্ধনের সঙ্গে বিলগ্ন যে বিন্যাস সে নিজেকে জিনিসটার থেকে উঁচুতে স্থাপন করে, জিনিস হিসাবে সেটাকে অরক্ষিত সত্যতাবিরহিতে করে রাখে। এইভাবে সীমায়িত করা। ঘেরের মধ্যে আনা নিজেকে নিকটস্থ জগতের নৈক্যরূপে নিজেকেও ছদ্মবেশ ধারণ করায়—যেমন কোনও কিছুকে ভুলে যাওয়া নিজেকেই ভুলে যায় আর তারই পিছু পিছু ভুলো বিস্মৃতির গর্ভের দিকে টানে পড়ে। বিস্মরণের ঘটনা শুধু স্মরণ করাকে লুকিয়ে পড়াতে ফেলে দেয় তাই নয় সেই পতনও একই সঙ্গে স্মরণ থেকে লুকোনোয় পড়ে যায়। সেই লুকানো আবার সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায়।

তবুও সীমাবাঁধাই এর সঙ্গে বিলগ্ন এইসব ছদ্মবেশ ধরার মধ্যেও জগতের খোল। উজ্জ্বল ক্ষেত্রটি আলোকিত হয়, সত্তার সত্যটি ঝলকে ওঠে। এই মুহূর্তটি সত্তার উপস্থিতিকে লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করার মুহূর্ত অর্থাৎ বিপদরূপে ও বিপদত্রাতারূপেও উপস্থাপনের মুহূর্ত। সীমাবন্ধনের মধ্যেও সত্তার উপস্থিতিকে লক্ষ্যে বলে নির্ধারণ করা যে সীমাবন্ধন তা অবগুণ্ঠিত হলেও একপলক দৃষ্টিপাত করে—অন্ধ ভাগ্য বা পূর্ব নির্দিষ্ট অদৃশ্য কপালের লিখন হয়ে থাকে না। সত্যবিরহিত সত্তার সত্যের সহসা ঝলককে আমরা 'অস্তি'/বিদ্যমান বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি এই নামে আখ্যাত করি। যখন আবরণ উন্মোচন করে অন্তর্দর্শন ঘটে তখন সত্তার ঝলক মানুষের সারবস্তুকেই আঘাত করে—অন্তর্দর্শনে মানুষকেই দেখা যায়। যখন এইভাবে অন্তর্দর্শনের ফলে মানুষ তার নিজের ইচ্ছাকে বর্জন করে আর নিজের থেকে দূরে রেখে নিজেকে ওই অন্তর্দর্শনের দিকে প্রক্ষেপ করে তখনই সে আপন সারস্বরূপ হবার দাবির অনুরূপ হতে পারে। এই অনরূপ হওয়ার সময় মানুষ তার নিজের মধ্যে নিজেকে জড়ো করে গুটিয়ে নেয় যাতে সে সুরক্ষিত জগতের মধ্যে মরজীবরূপে দিব্য ঐশ্বরিকের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে—অন্যথায় নয়। কারণ ঈশ্বরও তো 'অস্তি'—যখন তিনি একটি সত্তারূপে সত্তার অন্তর্গত একটি সত্তারূপে উপস্থিত হওয়ার সময় নিজেকে অনাবৃত করে জগতের জগৎ হয়ে ওঠারূপ ক্রিয়ার বাইরে চলে যায়।

যখন অন্তর্দৃষ্টি নিজেকে অনাবৃত করে নিজের সামনে আনে, যখন প্রযুক্তি সীমাবন্ধন বা ঘের দেওয়া রূপে বিভাসিত হয় কেবল তখনই স্থায়ী পুঁজির বিন্যাস করার মধ্যেই জগৎরূপে সত্তার সত্যের নিষেধ রয়েছে এটা আলাদা করে দেখতে পাই। ঠিক এই ভাবেই সামান্যত জগৎকে ঐতিহাসিকরূপে ধারণা করাকে গুছিয়ে বিন্যস্ত করার মধ্যেই এই নিষেধ রয়েছে। এইরকম চেষ্টা অসত্য এবং অমূলক। ভবিষ্যতের পিছনে ছোটা, হিসেব কষে তার একটা ছবি খাড়া করা, যাতে যা বর্তমান তাকে যা অবগুণ্ঠিত, যা অদ্যাবধি অনাগত তার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা তো এখন চলিত প্রাযুক্তিক গাণিতিক পরিসরের মধ্যেই করতে হচ্ছে। বর্তমান সম্বন্ধকে দৈহিক সংস্থানের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ক্রমাবনতি ও ক্ষতিরূপে, ভাগ্য বিপর্যয় ধ্বংস যেভাবেই দেখা হোক তারা প্রযুক্তির ব্যবহার। সেই ব্যবহার উপসর্গগুলিকে গুণে গুণে (এগুলিকে সীমাহীন ভাবে বাড়ানো যায় আর প্রত্যেকবারই নূতন হয়ে আসে) তাকেই হাতিয়ার করে করা হয়। অবস্থার এই বিশ্লেষণ লক্ষ্যই করে না যে প্রযুক্তির ব্যবহৃত অর্থগুলিকে মেনে নিয়ে এবং তদনুরূপ প্রণালিতেই এটা করা হচ্ছে। সেইজন্যই সেটা প্রাযুক্তিক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির জ্ঞান ঐ চেতনার মাপেই উপস্থাপিত হয়। কিন্তু ঘটনা হিসাবে উপস্থাপিত কোনও ইতিহাসই আমাদের সঙ্গে পথনির্দেশের উৎস বা সত্তার সত্যায়ন যা দিয়ে নিখিল বিশ্ব আপনাতে নীত হয় তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। কাজেই যা কিছু শুধুই প্রাযুক্তিক তা প্রযুক্তির সারবস্তুতে পৌঁছয় না। এমন কি নিজের বাইরের পরিবেষ্টন, নিজের ঘের দেওয়া এক্তিয়ারটিও চিনতে পারে না। কাজেই আমরা যখন যা কিছু আছে—সকাল 'অস্তি'—তার বিষয়ে অন্তর্দর্শনকে ভাষায় প্রকাশ করতে চাই—তখন আমাদের কালের কোনও বিশেষ অবস্থার বর্ণনা দিই না। সত্তার সেই পুঞ্জটিই আমাদের কাছে নিজেকে উচ্চারিত করে। প্রযুক্তির শাসনাধীন হয়ে আমাদের শ্রবণ ও দর্শন তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—আমরা এখনও কিছু শুনতে পাচ্ছি না। সত্তার জ্যোতিঃপুঞ্জ জিনিসটির অনাদর ক্ষতিকারকরূপ যে জগৎ সেই জগতের নিষেধ। নিষেধ নাস্তি বা শূন্যমাত্র নয়। এটা সত্তার সেই চূড়ান্ত রহস্য যা ঘের দেওয়ার নিয়মের মধ্যে স্থিত। ঈশ্বর বাঁচলেন না মরলেন তা মানুষের ধার্মিকতা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এমন কি দর্শন বা ভৌতবিজ্ঞান যে ধর্মতত্ত্ব হয়ে ওঠার উচ্চাশা করে তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সত্তার অন্তর্নিহিত জ্যোতিঃপুঞ্জের অন্তর থেকেই ঈশ্বর ঈশ্বরই কি না তা অনাবৃত হয়। যতক্ষণ না চিন্তা করে আমরা বিদ্যমানটিকে অভিজ্ঞতায় পাই ততক্ষণ আমরা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে পারি না।

যা অস্তি অর্থাৎ বিদ্যমান তদ্বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টি কি কখনও অবারিতভাবে ঘটবে? সেই আমরা দৃশ্যমান আমরা, সেই আমরাই সত্তার সারীভূত দৃষ্টিতে এমন ঘর খুঁজে পাবো যে আর কখনও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবো না? এইভাবে কি আমরা সালোক্যের সারে পৌঁছব যা বস্তুকে বস্তু করে তুলে জগৎকে নিকটে আনে? আমরা কি নৈকট্যের রাজ্যে অনায়াস বাসিন্দারূপে থাকতে পাবো? সেই রাজ্যে যেখানে চার ভাঁজে আকাশ পৃথিবী মরজীব ও দেবকুল থাকে? বিদ্যমান নিখিল বিশ্বের অন্তর্দৃষ্টি কি অনাবৃতভাবে নিজেকে ঘটাবে? যে দৃষ্টি

প্রযুক্তির সারকে দেখে আর তার অন্তর্নিহিত সত্তা বিষয়ে অবহিত হয় সেই দৃষ্টি দিয়ে কি আমরা সেই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারবো?

প্রযুক্তির সারের মধ্যে কি সত্তার ঝলক দেখতে পাবো? শান্ততারূপ শান্ততা থেকেই যে ঝলক বেরিয়ে আসে, জগতের উপস্থিতি রূপে সত্তাকে শান্ত করে?

জগৎ যেন জগদায়নরূপে সকল নৈকট্যায়নের নিকটতম হয়। কেন না এটাই তো সত্তার সত্যটিকে মানুষের নিকটে আনে আর সেভাবেই মানুষকে সেই ঘটনার উদ্ঘাটনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে দেয় অর্থাৎ স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়।

William Lovitt-এর ইংরেজি অনুবাদ
'The Turning' থেকে ভাষান্তর : কণকপ্রভা ব্যানার্জী